#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত
EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

18th May *to* 23rd May 2026

RICE IAS

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ১** **01**
   1.1. সমাজ 01
      1.1.1. জাতীয় জাতিশুমারি (CASTE CENSUS) এবং জাতিহীন সমাজের বিতর্ক 01

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** **05**
   2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা 05
      2.1.1. SHANTI আইন, ২০২৫-এর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা: 05
      2.1.2. ভারতের বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতা এবং আদালত অবমাননা ক্ষমতার সীমা 08

3. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** **12**
   3.1. অর্থনীতি 12
      3.1.1. ভারতে টেকসই কৃষি উন্নয়নের জন্য সার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি 12
      3.1.2. ভারতের রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা 14
   3.2. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা 18
      3.2.1. সাইবার যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক আইনি জবাবদিহিতার সংকট 18

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. সমাজ

1.1.1. জাতীয় জাতিশুমারি (CASTE CENSUS) এবং জাতিহীন সমাজের বিতর্ক

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি **সুপ্রিম কোর্ট** (Supreme Court) ২০২৭ সালের জনশুমারির অধীনে প্রস্তাবিত জাতিশুমারি বন্ধ করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।
- আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, কতজন **অনগ্রসর** (Backward) মানুষ রয়েছেন এবং কার কল্যাণমূলক সহায়তা প্রয়োজন, তা সরকারের জানা উচিত।
- ২০২৫ সালের এপ্রিলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৩১ সালের পর প্রথমবারের মতো জনশুমারিতে **জাতিভিত্তিক গণনা** (Caste Enumeration) অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

জাতিশুমারি কী?

- জাতিশুমারি হলো জাতীয় জনশুমারির অংশ হিসেবে জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে জনসংখ্যার **পদ্ধতিগত তথ্য সংগ্রহ** (Systematic collection of data)। প্রথাগত জনশুমারিতে সাক্ষরতা বা পেশার তথ্য নেওয়া হলেও, জাতিশুমারিতে ব্যক্তি ও পরিবারের সুনির্দিষ্ট জাতি চিহ্নিত করা হয়।
- এটি শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আয়ের সাথে সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক তথ্য (Socioeconomic data) তৈরিতে সাহায্য করে। এই তথ্য **প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ** (Evidence-based policymaking) এবং সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে জাতিভিত্তিক গণনার ঐতিহাসিক বিবর্তন

১. **ঔপনিবেশিক আমল:**
   - **১৮৮১ থেকে ১৯৩১:** ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিটি জনশুমারিতে বিস্তারিত জাতিভিত্তিক গণনা করা হতো। **১৯৩১ সালের জনশুমারি**, যাতে ৪,১৪৭টি জাতিগোষ্ঠী নথিভুক্ত ছিল, তা আজও অনগ্রসর শ্রেণি সংক্রান্ত নীতির প্রধান ভিত্তি।
   - **১৯৪১ সালের জনশুমারি:** তথ্য সংগ্রহ করা হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং **দেশভাগের** (Partition) কারণে তা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে তথ্যের বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়।

২. **স্বাধীন ভারতের সিদ্ধান্ত:**
   - **১৯৫১ সালের জনশুমারি:** স্বাধীনতার পর সরকার **তফসিলি জাতি** (SC) এবং **তফসিলি উপজাতি** (ST) ছাড়া অন্য কোনো জাতির গণনা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি একটি **জাতিহীন সমাজ** (Casteless society) গঠনের সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করেছিল।
   - ফলে, **অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির** (OBC) তথ্য ১৯৩১ সালের তথ্যের ওপরই থমকে যায়।

৩. **গুরুত্বপূর্ণ কমিশন ও তথ্যের অভাব:**
   - **কাকা কালেলকর কমিশন (১৯৫৩):** প্রথম অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন হিসেবে এটি ২,৩৯৯টি অনগ্রসর গোষ্ঠী চিহ্নিত করলেও ১৯৩১ সালের তথ্যের ওপরই নির্ভরশীল ছিল।
   - **মন্ডল কমিশন (১৯৭৮-৮০):** ১৯৩১ সালের তথ্যের ভিত্তিতে ওবিসি জনসংখ্যা ৫২% নির্ধারণ করে এবং সরকারি চাকরিতে **২৭% সংরক্ষণের** (27% Reservation) সুপারিশ করে।

- **ইন্দ্র সাহানি মামলা (১৯৯২):** সুপ্রিম কোর্ট ২৭% ওবিসি সংরক্ষণ বহাল রাখে এবং সংরক্ষণের মোট ঊর্ধ্বসীমা **৫০% (50% Ceiling)** নির্ধারণ করে দেয়।

৪. **SECC ২০১১ এবং বিহার জাতি সমীক্ষা ২০২৩:**

- **আর্থ-সামাজিক ও জাতিভিত্তিক জনশুমারি (SECC) ২০১১:** স্বাধীনতার পর জাতি গণনার প্রথম বড় প্রচেষ্টা হলেও একটি **মানসম্মত জাতি তালিকা (Standardised caste list)** না থাকায় তথ্যে প্রচুর ভুল থেকে যায় এবং তা প্রকাশিত হয়নি।
- **বিহার জাতি সমীক্ষা ২০২৩:** বিহার প্রথম রাজ্য হিসেবে বিস্তারিত জাতি সমীক্ষা প্রকাশ করে। এতে দেখা যায় ওবিসি এবং **অতি অনগ্রসর শ্রেণি (EBC)** মিলিয়ে মোট জনসংখ্যার **৬৩.১৩%**, যা জাতীয় স্তরে জাতিশুমারির দাবিকে নতুন করে জোরালো করে।

জাতিশুমারি বিতর্কে সাংবিধানিক দ্বন্দ্ব

ভারতের সাংবিধানিক কাঠামো জাতির প্রতি এক দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। একদিকে এটি সমতা ও জাতিহীন সমাজ চায়, অন্যদিকে কল্যাণের জন্য জাতির ওপর নির্ভর করে।

১. **এক পক্ষ: জাতিহীন সমাজের সাংবিধানিক লক্ষ্য**

- সংবিধান সমতা, মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজ গড়তে চায়। দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো জাতিভিত্তিক বৈষম্য দূর করে একটি **জাতিহীন সামাজিক ব্যবস্থা (Casteless social order)** গড়ে তোলা।
- **জাতির বিলোপ (Annihilation of Caste)** তত্ত্ব সামাজিক বর্জন দূর করার ওপর জোর দেয়।

২. **অন্য পক্ষ: জাতিভিত্তিক কল্যাণ ও প্রতিনিধিত্ব**

- তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসিদের জন্য শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- সামাজিক ন্যায়বিচার ও **প্রতিনিধিত্ব (Representation)** নিশ্চিত করার জন্য অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করা অপরিহার্য।

২০২৭ সালের জাতিশুমারি (Census 2027)

২০২৭ সালের জনশুমারি হবে স্বাধীন ভারতের প্রথম ব্যাপক জাতিভিত্তিক গণনা।

- **ডিজিটাল রূপান্তর:** এটি হবে প্রথম **সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনশুমারি (Fully digital census)**, যা তথ্যের ভুল কমিয়ে আনবে।
- **পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ:** সরকার বর্তমানে একটি **মাস্টার লিস্ট (Master list)** তৈরি করছে যাতে হাজার হাজার উপজাতিকে সঠিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়।

জাতিশুমারির গুরুত্ব

- **সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা (ধারা ১৫ ও ১৬):** সুপ্রিম কোর্ট এম. নাগরাজ এবং জার্নাইল সিং মামলায় **পরিমাণযোগ্য অভিজ্ঞতাগত তথ্য (Quantifiable empirical data)** প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। **ধারা ১৬(৪)** অনুযায়ী সংরক্ষণ বজায় রাখতে প্রতিনিধিত্বের অপর্যাপ্ততা প্রমাণ করতে এই তথ্য জরুরি।
- **বৈজ্ঞানিক কল্যাণমূলক লক্ষ্যমাত্রা:** এটি প্রান্তিক উপ-গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে, যা **উপ-শ্রেণিবিন্যাস (Sub-categorization)** বা রোহিনী কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।
- **৫০% ঊর্ধ্বসীমা যুক্তিযুক্ত করা:** ইন্দ্র সাহানি মামলার ৫০% সংরক্ষণের সীমা পরিবর্তন বা পুনর্বিবেচনা করতে সঠিক **জনতাত্ত্বিক তথ্যের (Demographic data)** প্রয়োজন।

- **উন্নয়নের সামাজিক অডিট** (Social Audit): গত ৭৫ বছরের সংরক্ষণের ফলে কোন গোষ্ঠী এগিয়েছে এবং কারা আজও **আন্তঃপ্রজন্ম দারিদ্র্যে** (Inter-generational poverty) আটকে আছে, তার অডিট করা সম্ভব হবে।
- **প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন:** ১৯৩১ সালের সেকেলে তথ্যের বদলে বর্তমান চাহিদার ভিত্তিতে সম্পদ বন্টন এবং **আনুপাতিক প্রয়োজন** (Proportional need) নিশ্চিত করা যাবে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক ও কেন্দ্রীয় জবাবদিহিতা:** সপ্তম তফসিল অনুযায়ী জনশুমারি **কেন্দ্রীয় তালিকার** (Union List) বিষয়। একটি জাতীয় জাতিশুমারি তথ্যের অভিন্নতা নিশ্চিত করবে এবং NCBC, NCSC ও NCST-এর মতো সংস্থাগুলোকে সাংবিধানিক সুরক্ষা পর্যবেক্ষণে শক্তিশালী করবে।

জাতিশুমারি পরিচালনার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **রাজনৈতিক অপব্যবহারের ঝুঁকি** (Risk of political misuse): সমালোচকরা মনে করেন যে, জাতির তথ্য **ভোট-ব্যাঙ্ক রাজনীতিকে** (Vote-bank politics) তীব্রতর করতে পারে এবং সামাজিক সংহতির পরিবর্তে জাতিভিত্তিক **রাজনৈতিক মেরুকরণকে** (Caste-based mobilisation) উৎসাহিত করতে পারে।
- **তথ্যের গুণমান এবং শ্রেণিবিন্যাসের সমস্যা** (Data quality and classification issues): ভারতে হাজার হাজার জাতি ও উপজাতি রয়েছে। স্ব-ঘোষণা (Self-declaration), বানানগত পার্থক্য এবং উপরিপাতিত পরিচয়ের (Overlapping identities) কারণে SECC 2011-এর মতো এখানেও **অনির্ভরযোগ্য তথ্য** (Unreliable data) তৈরির সম্ভাবনা থাকে।
- **জাতিগত পরিচয়কে শক্তিশালী করা** (Reinforcing caste identity): বিরোধীদের মতে, নাগরিকদের জাতি চিহ্নিত করতে বাধ্য করা তাদের মধ্যে **জাতিগত চেতনা** (Caste consciousness) বাড়িয়ে দিতে পারে, যা একটি **জাতিহীন সমাজের** (Casteless society) সাংবিধানিক লক্ষ্যের পরিপন্থী।
- **গোপনীয়তা এবং অপব্যবহারের উদ্বেগ** (Privacy and misuse concerns): জাতির তথ্যের সাথে অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত তথ্য যুক্ত করা হলে, সুরক্ষার অভাব থাকলে তা **বৈষম্য** (Discrimination), প্রোফাইলিং বা সংবেদনশীল তথ্যের অপব্যবহারের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
- **পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ** (Methodological challenges): উপজাতিগত বিরোধ, **আন্তঃজাতি বিবাহ** (Inter-caste marriages) এবং মিশ্র ঐতিহ্যের (Mixed heritage) কারণে পরিচয় নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল ও রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল।

ভবিষ্যৎ পন্থা

- **সংবিধিবদ্ধ গোপনীয়তা রক্ষা:** সরকারকে **জনশুমারি আইন, ১৯৪৮** (Census Act, 1948)-এর ১৫ নম্বর ধারা কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে যাতে ব্যক্তিগত তথ্য **গোপন** (Confidential) থাকে। এটি রাজনৈতিক প্রোফাইলিং রুখতে এবং জনবিশ্বাস বজায় রাখতে অপরিহার্য।
- **মানসম্মত মাস্টার লিস্ট:** ২০১১ সালের ভুল এড়াতে **ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের দপ্তরকে** (ORGI) সক্রিয়ভাবে একটি ব্যাপক **জাতির মাস্টার লিস্ট** প্রকাশ করতে হবে। এই স্বচ্ছতা গণনার আগেই আঞ্চলিক নামগত অসঙ্গতি দূর করতে সাহায্য করবে।
- **সমন্বিত আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক:** জাতির তথ্যকে সাক্ষরতা, জমির মালিকানা এবং পেশাগত অবস্থার মতো **আর্থ-সামাজিক সূচকের** (Socio-economic indices) সাথে বৈজ্ঞানিকভাবে মানচিত্রায়িত করতে হবে। এটি অনগ্রসরতাকে কেবল জনসংখ্যার ভিত্তিতে নয়, বরং প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।
- **ডিজিটাল সততা ও সামাজিক অডিট:** ভারতের প্রথম **সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনশুমারি** হিসেবে রিয়েল-টাইম তথ্য যাচাইয়ের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। গণনার পর সামগ্রিক তথ্যকে স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা **সামাজিক অডিট** (Social audits) করাতে হবে যাতে তা বিচার বিভাগীয় যাচাইয়ে টিকে থাকতে পারে।

- **'জাতিহীন' পরিচয়কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** নাগরিকদের **'জাতিহীন'** (Casteless) হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার বিকল্পটিকে উৎসাহিত করতে হবে। এই বিভাগটি ট্র্যাক করা **আধুনিকায়নের** (Modernization) একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হবে, যা আম্বেদকরের **'জাতির বিলোপ'** (Annihilation of Caste) লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করবে।

উপসংহার

জাতিশুমারি মানে জাতিকে উদযাপন করা নয়, বরং এর অমীমাংসিত ফলাফলগুলোর মোকাবিলা করা। ভারত নয় দশকের পুরনো অনুমানের ওপর ভিত্তি করে একটি **সুষ্ঠু কল্যাণ রাষ্ট্র** (Fair welfare state) গড়তে পারে না। নির্ভুলভাবে জাতি গণনা করা এবং একই সাথে প্রত্যেক নাগরিকের **'জাতিহীন'** পরিচয় দেওয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখাই হলো একটি সৎ পথ, যা শেষ পর্যন্ত এমন এক সমান সমাজ গড়ে তুলবে যেখানে এই ধরনের গণনার আর প্রয়োজন থাকবে না।

Q. The demand for a caste census reflects the tension between the constitutional vision of a casteless society and the practical need for caste-based welfare policies. Critically examine. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1 SHANTI আইন, ২০২৫-এর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা: জাতীয় শক্তির চাহিদা এবং জীবন ধারণের অধিকারের ভারসাম্য

প্রেক্ষাপট

- ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act, 2025-এর সাংবিধানিক বৈধতা পরীক্ষা করছে, যা পারমাণবিক খাতে **বেসরকারি অংশগ্রহণ** নিশ্চিত করে।
- আইনি চ্যালেঞ্জের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো—নতুন আইনে প্রদত্ত **আর্থিক দায়বদ্ধতার সীমা** (liability caps) এবং **সরবরাহকারীদের অব্যাহতি** (supplier exemptions) সংবিধানের **২১ নম্বর অনুচ্ছেদে** বর্ণিত মৌলিক **জীবন ধারণের অধিকার** (Right to Life) লঙ্ঘন করে কি না।

ভারতের বর্তমান ও ঐতিহাসিক পারমাণবিক দায়বদ্ধতা কাঠামো

SHANTI আইন প্রবর্তনের আগে, ভারত একটি কঠোর ব্যবস্থা অনুসরণ করত যা মূলত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতাকে অগ্রাধিকার দিত।

- **পারমাণবিক শক্তি আইন, ১৯৬২** (Atomic Energy Act of 1962): এই ঐতিহাসিক কাঠামোটি পারমাণবিক শক্তিকে একচেটিয়া **রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া আধিপত্য** হিসেবে বজায় রেখেছিল, যা মূলত 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড' (NPCIL)-এর মতো রাষ্ট্রীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হতো।
- **সিভিল লায়বিলিটি ফর নিউক্লিয়ার ড্যামেজ অ্যাক্ট** (CLNDA), ২০১০: আগের এই আইনে **"রাইট অফ রিকোর্স"** (Right of Recourse) বা প্রতিকারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা অপারেটরদের ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জামের জন্য সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দিত; এই বিধানটি বর্তমানে অত্যন্ত শিথিল করা হয়েছে।
- **বেসরকারি বাজারের দিকে পরিবর্তন:** SHANTI আইনের অধীনে এই রূপান্তরটি সরকারি অর্থায়নে চালিত জ্বালানি নিরাপত্তা থেকে বিশ্বব্যাপী **বেসরকারি পুঁজি** সম্বলিত বাজার-চালিত পদ্ধতির দিকে একটি বড় পদক্ষেপ।

SHANTI আইন, ২০২৫-এর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

SHANTI আইন ভারতের পারমাণবিক শক্তি প্রশাসনে একটি আমূল পরিবর্তন এনেছে, যা ১৯৬২ সালের পারমাণবিক শক্তি আইন এবং ২০১০ সালের সিভিল লায়বিলিটি আইনকে কার্যত বাতিল করে। এটি ভারতের **নিট-জিরো নির্গমন** (Net-Zero emissions) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পারমাণবিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইনি কাঠামোকে আধুনিকীকরণ করতে চায়।

- **রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান:** প্রথমবারের মতো, এই আইন **বেসরকারি সংস্থা** এবং **বিদেশি কর্পোরেশনগুলিকে** ভারতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মালিকানা এবং পরিচালনার অনুমতি দেয়।
- **স্তরভিত্তিক দায়বদ্ধতা কাঠামো:** এই আইন চুল্লির তাপীয় ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে একটি ধাপে ধাপে দায়বদ্ধতা ব্যবস্থা চালু করে। বড় চুল্লিগুলির (৩,০০০ মেগাওয়াট থার্মালের উপরে) ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার সীমা প্রায় **৩,০০০ কোটি থেকে ৪,০০০ কোটি টাকা**।

- **সরবরাহকারীর সুরক্ষা (Supplier Indemnity):** ২০১০ সালের আইনের থেকে এটি একটি বড় বিচ্যুতি কারণ এতে সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে **"রাইট অফ রিকোর্স"** বাতিল করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায়, সরবরাহকারীরা সাধারণত দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি পায়, যদি না কোনো লিখিত চুক্তি বা ক্ষতির স্পষ্ট উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়।
- **সংহত নিয়ন্ত্রণ:** এই আইন **অ্যাটোমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড**-কে সংবিধিবদ্ধ মর্যাদা দেয় এবং একটি **নিউক্লিয়ার লায়বিলিটি ফান্ড** (Nuclear Liability Fund) গঠন করে।

কেন সরকার SHANTI আইনকে কৌশলগত সমর্থন দিচ্ছে?

- **জ্বালানি নিরাপত্তা ও বিদ্যুতের চাহিদা:** ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং শিল্পের প্রসারের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি জরুরি। পারমাণবিক শক্তিকে একটি স্থিতিশীল উৎস হিসেবে দেখা হচ্ছে যা আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাবে এবং **ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা** থেকে ভারতকে রক্ষা করবে।
- **জলবায়ু প্রতিশ্রুতি এবং নিট-জিরো ২০৭০:** ২০৭০ সালের মধ্যে **নিট-জিরো** নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পারমাণবিক শক্তি ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- **বিদেশি বিনিয়োগ এবং উন্নত প্রযুক্তি:** বড় পারমাণবিক প্রকল্পের জন্য প্রচুর বিনিয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন। বিদেশি অংশগ্রহণের মাধ্যমে **আধুনিক চুল্লি** এবং উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- **কৌশলগত প্রতিযোগিতা:** ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মতো দেশগুলি বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে সাফল্য পেয়েছে। তাই ভারতের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা এবং **কৌশলগত সক্ষমতা** বৃদ্ধিতে এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হচ্ছে।

SHANTI আইন, ২০২৫-এর মূল চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **সাংবিধানিক "পরম দায়বদ্ধতা" (Absolute Liability) মানের অবক্ষয়**

- **ওলিউম গ্যাস লিক মামলা (১৯৮৬)-এর প্রেক্ষাপট:** ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর সুপ্রিম কোর্ট Absolute Liability বা পরম দায়বদ্ধতার নীতি তৈরি করে, যেখানে বলা হয়েছিল ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত সংস্থাকে যে কোনো ক্ষতির জন্য **শর্তহীন ক্ষতিপূরণ** দিতে হবে।
- **আইনি সংঘাত:** দায়বদ্ধতাকে **৪,০০০ কোটি টাকার** নিচে সীমাবদ্ধ করে এই আইন "পরম" কর্তব্যকে সীমিত করে দিচ্ছে, যার ফলে বড় কর্পোরেশনগুলো বিপর্যয়ের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়ভার থেকে মুক্তি পেতে পারে।
- **ডিপ পকেট নীতি (Deep Pocket Principle):** ঐতিহাসিক বিচারিক নীতি অনুযায়ী, সংস্থা যত বড় এবং সমৃদ্ধ হবে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তত বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু এই আইনে সবার জন্য একই নিম্ন সীমা ধার্য করা হয়েছে।

২. **আর্থিক ঝুঁকি এবং "ক্ষতির সামাজিকীকরণ" (Socialization of Losses)**

- **করদাতার ঝুঁকি:** যদি চেরনোবিল বা ফুকুশিমার মতো বড় দুর্ঘটনা ঘটে, তবে ক্ষতির পরিমাণ ৪,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।
- **অবশিষ্ট বোঝা:** অপারেটরের দায় সীমাবদ্ধ হওয়ায়, পরিচ্ছন্নতা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কোটি কোটি টাকা **ভারত সরকার এবং সাধারণ করদাতাদের** বহন করতে হবে।
- **পলিউটার পেস (Polluter Pays) নীতির অবমাননা:** এটি পরিবেশগত আইনের মূল নীতিকে লঙ্ঘন করে, কারণ ঝুঁকির জন্য দায়ী সংস্থা সম্পূর্ণ আর্থিক পরিণাম ভোগ করছে না।

৩. **সরবরাহকারীর অব্যাহতি এবং 'মোরাল হ্যাজার্ড' (Moral Hazard)**

- **প্রতিকারের অধিকার বিলোপ:** সরবরাহকারীদের সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়ার ফলে অপারেটররা ত্রুটিপূর্ণ সরঞ্জামের জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না।

- **নিরাপত্তার ঘাটতি:** আইনি পরিণতির ভয় না থাকায় সরবরাহকারীরা **নিরাপত্তার মান বজায় রাখতে** কম উৎসাহিত হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকির সৃষ্টি করে।

৪. **বিদেশি বিনিয়োগের (FDI) জন্য "রেশ টু দ্য বটম" (Race to the Bottom)**

- **নিরাপত্তার বিনিময়ে পুঁজি:** সমালোচকদের মতে, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে গিয়ে জননিরাপত্তা এবং **২১ নম্বর অনুচ্ছেদকে** বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে।
- **বৈশ্বিক দ্বিমুখী নীতি:** বিদেশি সংস্থাগুলি ভারতে সীমিত দায়বদ্ধতা উপভোগ করলেও তাদের নিজস্ব দেশে অনেক বেশি কঠোর আইনি জবাবদিহিতার সম্মুখীন হয়।

৫. **প্রাতিষ্ঠানিক এবং নিয়ন্ত্রক তদারকির দুর্বলতা**

- **রেগুলেটরি ক্যাপচার (Regulatory Capture):** বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার চাপে নিরাপত্তা পরিদর্শন শিথিল হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- **জবাবদিহিতার অভাব:** বেসরকারি সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজ করলেও, তাদের **১২ নম্বর অনুচ্ছেদের** অধীনে "রাষ্ট্র" হিসেবে গণ্য না করায় নাগরিকরা তাদের সরাসরি জবাবদিহি করতে পারে না।

আগামীর পথ

- **লায়বিলিটি ক্যাপ বা দায়ের সীমা সংশোধন:** একটি পারমাণবিক দুর্ঘটনার বাস্তব ক্ষয়ক্ষতির কথা মাথায় রেখে এই সীমাটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।
- **সরবরাহকারীর দায়বদ্ধতা পুনঃস্থাপন:** সর্বোচ্চ নিরাপত্তার মান বজায় রাখতে সরবরাহকারীদের আইনি ও বাণিজ্যিক জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
- **স্বাধীন পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ গঠন:** একটি সম্পূর্ণ **স্বায়ত্তশাসিত এবং প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম** নিয়ন্ত্রক সংস্থা তৈরি করতে হবে যা লাইসেন্স প্রদান এবং নিরাপত্তা অডিট পরিচালনা করবে।
- **বীমা এবং ক্ষতিপূরণ পুল:** অপারেটর, সরবরাহকারী এবং সরকারের অংশগ্রহণে একটি নিবেদিত জাতীয় তহবিল গঠন করতে হবে।
- **সংসদীয় পর্যালোচনা:** আইনটিকে একটি **সংসদীয় স্থায়ী কমিটির** কাছে পাঠাতে হবে যেখানে বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের মতামত নেওয়া যায়।
- **আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যোগদান:** ভারত 'Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage' অনুসমর্থন করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

উপসংহার

SHANTI আইন, ২০২৫ সংক্রান্ত বিতর্কটি এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, ভারতের **জ্বালানি নিরাপত্তা** এবং **জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা** অর্জনের জন্য পারমাণবিক শক্তির সম্প্রসারণ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ঠিকই, তবে **জননিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা, সাংবিধানিক অধিকার** এবং কঠোর **কর্পোরেট জবাবদিহিতা** অবশ্যই ভারতের পারমাণবিক শাসন কাঠামোর মূল নীতি হিসেবে বজায় থাকতে হবে।

Q. Balancing nuclear energy expansion with public safety remains one of the biggest governance challenges for India. In the light of the SHANTI Act, 2025, analyse the key challenges and suggest suitable reforms. 15 Marks

2.1.2. ভারতের বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতা এবং আদালত অবমাননা ক্ষমতার সীমা

প্রেক্ষাপট

একটি গণতন্ত্রে আদালতের বৈধতা কেবল সাংবিধানিক কর্তৃত্ব থেকে আসে না, বরং **জনসাধারণের বিশ্বাসের** (Public Trust) ওপর ভিত্তি করেও গড়ে ওঠে। এই বিশ্বাস তখনই বজায় থাকে যখন প্রতিষ্ঠানগুলো **জনসাধারণের পর্যালোচনার** (Public Scrutiny) জন্য উন্মুক্ত থাকে। আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা বিচারবিভাগের মর্যাদা রক্ষার জন্য একটি সাংবিধানিক রক্ষাকবচ হলেও, সাম্প্রতিক কিছু **অলঙ্কারিক আধিক্য** (Rhetorical Excesses) এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ বাকস্বাধীনতার ওপর একটি **ভীতিপ্রদ প্রভাব** (Chilling Effect) সৃষ্টি করার উদ্বেগ তৈরি করেছে।

সাম্প্রতিক বিচারবিভাগীয় বিতর্ক

একটি **"ভীতিপ্রদ প্রভাব"** (Chilling Effect) তখনই ঘটে যখন মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তির ভয়ে তাদের মনের কথা বলতে ভয় পায়।

- **কঠোর ভাষার প্রয়োগ** (Use of Harsh Language): সম্প্রতি একজন আইনজীবীর পদোন্নতি সংক্রান্ত শুনানির সময়, ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্যকান্ত কিছু ব্যক্তি এবং RTI **অ্যাক্ট** ব্যবহারকারী তরুণ আইনজীবীদের বর্ণনা করতে **"পরজীবী"** (Parasites) এবং **"তেলাপোকা"** (Cockroaches) এর মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন। এমনকি এই শব্দগুলি যদি ভুয়ো ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেও বলা হয়ে থাকে, তবুও দেশের সর্বোচ্চ আসন থেকে এই ধরনের তকমা ব্যবহার করা **ভয় এবং অসম্মানের** পরিবেশ তৈরি করে।
- NCERT **পাঠ্যপুস্তক বিতর্ক** (NCERT Textbook Controversy): NCERT স্কুলের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিতর্কের পর, সুপ্রিম কোর্ট সেই অধ্যায়গুলি খসড়া তৈরিতে সহায়তাকারী **তিনজন শিক্ষাবিদের** প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাঁদের কোনো **পক্ষ সমর্থনের সুযোগ** (Fair Hearing) না দিয়েই সরকারি স্কুলের পাঠ্যক্রমের কাজ থেকে কার্যত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা **প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের** (Natural Justice) মৌলিক নীতির পরিপন্থী।
- **বিচারক এবং অভিযোগকারী যখন একই ব্যক্তি** (Aggrieved Party and Arbiter): এই ঘটনাটি আদালতকে একই সাথে **ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ এবং বিচারক** (Aggrieved Party and Arbiter) হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। এটি সরাসরি "Nemo judex in causa sua" নীতিটি লঙ্ঘন করে (যার অর্থ: কেউ নিজের মামলার বিচারক হতে পারবে না)। ন্যায়বিচার কেবল হওয়াই উচিত নয়, বরং এটি একটি **নিরপেক্ষ পক্ষের** মাধ্যমে হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হওয়া উচিত।
- **গ্যাগ অর্ডার সংক্রান্ত মামলা** (Gag Order Case): আলী খান মাহমুদাবাদ মামলার মতো ঘটনাগুলিতে, আদালত আইনি সুরক্ষা প্রদান করলেও একটি **"গ্যাগ অর্ডার"** (Gag Order) বা নীরব থাকার নির্দেশ জারি করেছে। এটি এমন একটি প্রবণতা দেখায় যেখানে আদালত আইন ভঙ্গ হয়েছে কি না তা বিচার করার পরিবর্তে **জনসাধারণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ** করার চেষ্টা করছে।
- RTI **স্বচ্ছতার অভাব:** যখন একজন সাংবাদিক সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির কাছে বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তথ্য চেয়েছিলেন, তখন সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। অথচ, পরে **আইন মন্ত্রক** (Law Ministry) দেখায় যে সেই তথ্যের অস্তিত্ব ছিল। রেজিস্ট্রি তখন এই অনুরোধটিকে **"ফিশিং অ্যান্ড রোভিং"** (Fishing and Roving) বলে অভিহিত করে। এটি স্বচ্ছতার আইন মেনে চলার পরিবর্তে আদালতের নিজের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার মতো দেখায়।

বিচারবিভাগ কেন জনসাধারণের সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত?

- **রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগকারী জন-প্রতিনিধি হিসেবে বিচারক:** প্রাক্তন সিজেআই (CJI) ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড় যেমন পর্যবেক্ষণ করেছেন, বিচারকরা হলেন জন-প্রতিনিধি যারা রাষ্ট্রের বিশাল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। যেহেতু তাঁদের সিদ্ধান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে, তাই বিচারবিভাগকেও—নির্বাহী বা আইনসভার মতো—**জনসাধারণের পর্যালোচনা** (Public Scrutiny) এবং **গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার** (Democratic Accountability) অধীনে থাকা উচিত।
- **স্বীকৃত হাতিয়ার হিসেবে তথ্য জানার অধিকার** (RTI)**:** সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা আনতে RTI **আইন, ২০০৫** প্রণয়ন করা হয়েছিল। বিচারবিভাগীয় প্রশাসন সম্পর্কে তথ্য চাওয়া একটি **বৈধ গণতান্ত্রিক অধিকার** এবং আদালতগুলোর একে "বিদ্বেষমূলক সক্রিয়তা" বা "অহেতুক অনুসন্ধান" হিসেবে দেখা উচিত নয়।
- **ভিন্নমতের ওপর 'ভীতিপ্রদ প্রভাব' (Chilling Effect) রোধ:** বিচারবিভাগ যখন আনুষ্ঠানিক আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে কঠোর ভাষা ব্যবহার করে, তখন এটি যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই একটি প্রাতিষ্ঠানিক নিন্দার মতো কাজ করে। এটি একটি **"ভীতিপ্রদ প্রভাব"** (Chilling Effect) তৈরি করে, যার ফলে আইনজীবী, সাংবাদিক এবং শিক্ষাবিদরা বৈধ উদ্বেগ প্রকাশ করতে ভয় পান, যা শেষ পর্যন্ত **যুক্তিসঙ্গত ভিন্নমতকে** (Legitimate Dissent) স্তব্ধ করে দেয়।
- **বিচারবিভাগীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা:** আইনের শাসনের একটি মূল নীতি হলো—যিনি নিজে সংক্ষুব্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত, তিনি নিজেই বিচারক হতে পারেন না। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে আদালতকে অবশ্যই **"সংক্ষুব্ধ পক্ষ"** (Aggrieved Party) এবং **"বিচারক"** (Arbiter) হিসেবে নিজের ভূমিকাকে আলাদা করতে হবে যাতে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্বের ধারণা তৈরি না হয়।
- **সামাজিক অডিট এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণ:** সমালোচনা একটি **সামাজিক অডিট** (Social Audit) হিসেবে কাজ করে যা বিচারবিভাগকে একটি বিচ্ছিন্ন "আইভরি টাওয়ার" বা সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে বাধা দেয়। পণ্ডিতদের বিশ্লেষণ এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আইনি ব্যবস্থাকে আরও গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে, যা প্রায়শই **পুরানো বা ভুল রায়** (Outdated or Incorrect Judgments) সংশোধনের পথ প্রশস্ত করে।
- **বাকস্বাধীনতা সর্বজনীন:** ভারতীয় সংবিধানের **ধারা ১৯(১)(ক)** কথা বলার অধিকারকে সুরক্ষা দেয়। এই অধিকারের মধ্যে সরকারের যেকোনো শাখার—আদালতসহ—কাজের প্রতি অসংকুচিতভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত, যতক্ষণ না তা শালীনভাবে করা হয়।

আদালত অবমাননার ক্ষমতা এবং বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতার ভারসাম্যের চ্যালেঞ্জ

১. **দায়বদ্ধতার অভাব** (Accountability Gap)**:** মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসেবে বিচারবিভাগ বিশাল সাংবিধানিক ক্ষমতা ভোগ করে, কিন্তু বিচারবিভাগের **স্বাধীনতা** (Judicial Independence) ক্ষুণ্ণ না করে বিচারকদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য কোনো শক্তিশালী **বাহ্যিক তদারকি ব্যবস্থার** (External Accountability Mechanism) অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

২. **অবমাননা আইন বনাম বাকস্বাধীনতা: আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১**-এর অধীনে "আদালতকে কলঙ্কিত করা" (Scandalising the Court)-এর মতো অস্পষ্ট শব্দের ব্যবহার প্রায়শই **ধারা ১৯(১)(ক)**-এর অধীনে বাকস্বাধীনতার সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করে। এর ফলে গঠনমূলক সমালোচনা এবং প্রকৃত বিচারিক কাজে বাধা দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. **স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থার অভাব:** বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য কোনো **স্বাধীন ব্যবস্থার অভাব** এবং বিচার বিভাগীয় প্রশাসন ও অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রক্রিয়ার **সীমিত স্বচ্ছতা** জনসাধারণের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে।

৪. **ডিজিটাল যুগে ভুল তথ্যের সংকট:** বর্তমানে আদালতগুলো পরিকল্পিত **ভুল তথ্য প্রচার** (Misinformation Campaigns) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপত্তিকর আলোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। ডিজিটাল যুগের এই হুমকিগুলো মোকাবিলা করার জন্য নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো না থাকায় বিচারকরা মাঝে মাঝে এমন প্রতিক্রিয়া দেখান যা তাঁদের নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে।

৫. **জনসাধারণের আস্থার অবনতি:** বিচারিক বিলম্ব, ৫ কোটিরও বেশি **মামলা ঝুলে থাকা** (Pendency of Cases) এবং **কলেজিয়াম ব্যবস্থায়** (Collegium System) স্বচ্ছতার অভাব জনসাধারণের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে, যার ফলে বিচারবিভাগের কাজের ওপর সমালোচনা ও স্ক্রুটিনি ক্রমশ বাড়ছে।

বাকস্বাধীনতা এবং আদালত অবমাননা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রিম কোর্ট রায়

- **রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (১৯৫০):** এই যুগান্তকারী রায় প্রতিষ্ঠা করেছিল যে বাকস্বাধীনতা হলো সমস্ত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ভিত্তি এবং এর ওপর যেকোনো বিধিনিষেধ অবশ্যই আইন দ্বারা সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
- **ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ বনাম টি.এন. নাম্বিয়ার (১৯৭০):** আদালত নিশ্চিত করেছে যে জনস্বার্থে করা **সৎ সমালোচনা** (Bona fide Criticism) সর্বদা সুরক্ষিত, তবে বিচারিক কর্তৃত্বের ওপর বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণ অবমাননা হিসেবে গণ্য হতে পারে।
- **এস. মুলগাওকর মামলা (১৯৭৮):** বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার **"উদারতার নিয়ম"** (Magnanimity Rule) প্রবর্তন করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে আদালতগুলোর অবমাননার ক্ষমতা প্রয়োগে ধীর হওয়া উচিত এবং তথ্যহীন বা তুচ্ছ সমালোচনা উপেক্ষা করা উচিত।
- **পি.এন. দুদা বনাম পি. শিব শঙ্কর (১৯৮৮):** আদালত রায় দিয়েছে যে কেউ বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা করার জন্য কঠোর ভাষা ব্যবহার করলেও তা অবমাননা নয়, যদি না তা বিচারে কোনো হস্তক্ষেপ করে।
- **অরুন্ধতী রায় অবমাননা মামলা (২০০২):** আদালত জোর দিয়েছিল যে বাকস্বাধীনতা সর্বাগ্রে থাকলেও এটি এমনভাবে আদালতকে **"কলঙ্কিত"** (Scandalize) করতে ব্যবহার করা যাবে না যা জনসাধারণের বিশ্বাস নাড়িয়ে দেয়।
- **প্রশান্ত ভূষণ অবমাননা মামলা (২০২০):** বিচারবিভাগের সমালোচনা করে টুইট করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণকে দোষী সাব্যস্ত করে, যা বাকস্বাধীনতা এবং **বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতা** (Judicial Accountability) নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়।

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত সেরা অনুশীলন

- **যুক্তরাজ্য** (United Kingdom): ২০১৩ সালে যুক্তরাজ্য **"আদালতকে কলঙ্কিত করা"** (Scandalizing the Court) সংক্রান্ত অপরাধটি বাতিল করেছে। তারা স্বীকার করেছে যে বিচারকদের সম্মান তাঁদের **আচরণ এবং রায়ের** মাধ্যমে টিকে থাকা উচিত, প্রসিকিউশনের হুমকির মাধ্যমে নয়।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** (United States): এখানে **"স্পষ্ট এবং বর্তমান বিপদ"** (Clear and Present Danger) পরীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। কোনো বক্তব্যকে কেবল তখনই শাস্তি দেওয়া হয় যদি তা বিচারের নিরপেক্ষতার জন্য তাৎক্ষণিক এবং গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করে।
- **ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত** (ECHR): এই আদালত শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিকদের সমালোচনার জন্য অনেক বড় ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। তাদের মতে, সাধারণ নাগরিকদের তুলনায় বিচারবিভাগকে অনেক বেশি **সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা** রাখতে হবে।

একটি আত্মবিশ্বাসী ও স্বচ্ছ বিচারবিভাগ গঠনের ভবিষ্যতের পথ

মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতীয় বিচারবিভাগকে অবশ্যই **স্বচ্ছতা এবং সংযমের** কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

- **আদালত অবমাননা আইন সংশোধন:** সংসদ এবং বিচারবিভাগকে একসাথে মিলে **আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১** সংশোধন করতে হবে। প্রকৃত বিচারে বাধা এবং কেবল বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত বা বিচারকদের আচরণের সমালোচনার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করা প্রয়োজন।

- **আদালতের জন্য RTI কাঠামো শক্তিশালী করা:** সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টগুলিকে অবশ্যই **তথ্য জানার অধিকার আইন** (RTI) সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। অভিযোগ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং বিচারবিভাগীয় শূন্যপদ সম্পর্কে তথ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে **জনসাধারণের আস্থা** বৃদ্ধি পায়।
- **স্বাধীন দায়বদ্ধতা সংস্থা প্রতিষ্ঠা:** যুক্তরাজ্যের 'জুডিশিয়াল কন্ডাক্ট ইনভেস্টিগেশন অফিস'-এর মতো একটি **স্বচ্ছ ও স্বাধীন ব্যবস্থা** ভারতেও তৈরি করা উচিত, যা বিচারকদের বিরুদ্ধে আসা অভিযোগগুলি নিরপেক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে তদন্ত করবে।
- **মৌখিক পর্যবেক্ষণে সংযম প্রদর্শন:** বিচারকদের মনে রাখতে হবে যে এজলাস থেকে করা **অনানুষ্ঠানিক মন্তব্যও** বিশাল প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বহন করে। এটি কোনো আনুষ্ঠানিক আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই আইনজীবী, শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিকদের মধ্যে একটি ব্যাপক **ভীতিপ্রদ প্রভাব** (Chilling Effect) তৈরি করতে পারে।
- **প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারকে কঠোরভাবে মেনে চলা:** আদালতকে অবশ্যই **"কেউ নিজের মামলার বিচারক হতে পারবে না"** (Nemo Judex in Causa Sua)—এই নীতিটি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। বিশেষ করে যেখানে বিচারবিভাগের নিজস্ব কাজ বা সুনাম পরীক্ষার মুখে থাকে।
- **'পাবলিক অ্যাক্টর মডেল' গ্রহণ:** বিচারবিভাগের উচিত সেই মানসিকতায় ফিরে আসা যে এটি একটি **জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান** (Public Actor) যা জনসাধারণের পর্যালোচনার অধীন। এটি বার (Bar), প্রেস এবং শিক্ষাবিদদের সাথে একটি স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

উপসংহার

একটি মহান বিচারবিভাগের প্রকৃত মাপকাঠি সমালোচনাকে স্তব্ধ করার ক্ষমতা নয়, বরং এটি খোলাখুলি এবং নির্ভয়ে গ্রহণ করার সদিচ্ছা। কারণ যে প্রতিষ্ঠান **জনসাধারণের সমালোচনা** সহ্য করতে পারে না, তা শেষ পর্যন্ত তার মূল ভিত্তি অর্থাৎ মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তাই **স্বচ্ছতা** গ্রহণ করে এবং **বাকস্বাধীনতা** সমুন্নত রেখে বিচারবিভাগ নিশ্চিত করতে পারে যে এটি জনগণের চোখে **সংবিধানের চূড়ান্ত রক্ষক** (Ultimate Custodian) হিসেবে টিকে থাকবে।

Q. Judicial dignity and democratic accountability must coexist in a constitutional democracy. Examine the challenges in balancing contempt powers with freedom of speech in India. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

3.1. অর্থনীতি

3.1.1. ভারতে টেকসই কৃষি উন্নয়নের জন্য সার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি

ভূমিকা

- পশ্চিম এশিয়ার চলমান উত্তেজনা এবং জ্বালানি ও সারের ক্রমবর্ধমান দাম সার উৎপাদনের জন্য **আমদানিকৃত উপকরণের** (Imported Inputs) ওপর ভারতের নির্ভরশীলতাকে উন্মোচিত করেছে। ভারত তার ইউরিয়া চাহিদার প্রায় ৮০% অভ্যন্তরীণভাবে মেটালেও, এই খাতটি আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, দেশে পর্যাপ্ত **রক ফসফেট** (Rock Phosphate) ভাণ্ডার না থাকায় ফসফ্যাটিক সার মূলত আমদানি করা হয়।
- সৌর শক্তি ব্যবহার করে জলের ইলেকট্রোলাইসিসের মাধ্যমে উৎপাদিত **গ্রিন অ্যামোনিয়া** (Green Ammonia) সারের বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে, তবে জলকষ্টপ্রবণ অঞ্চলে এর স্থায়িত্ব সীমিত।
- একই সাথে, নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস সার ভারতের **খাদ্য নিরাপত্তার** (Food Security) জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা সার ভর্তুকিতে ব্যয় করা সত্ত্বেও, ভর্তুকির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি অংশ কার্যকর কৃষি উৎপাদনের পরিবর্তে **অদক্ষতা এবং দূষণের** (Inefficiency and Pollution) মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায়।

রাসায়নিক সার সম্পর্কে ধারণা

রাসায়নিক সার হলো শিল্পজাত পদার্থ যা উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির উচ্চ ঘনত্ব ধারণ করে। এটি মূলত **হেবার-বশ প্রক্রিয়ার** (Haber-Bosch Process) মাধ্যমে উৎপাদিত হয়।

- **তিনটি প্রধান পুষ্টি উপাদান:** NPK
  - **নাইট্রোজেন (N):** পাতা ও কাণ্ডের বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। ভারতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত রূপ হলো **ইউরিয়া** (Urea)।
  - **ফসফরাস (P):** শিকড়ের বিকাশ এবং বীজ গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান রূপ হলো DAP (Di-ammonium Phosphate), যা ভারত প্রায় সম্পূর্ণ আমদানি করে।
  - **পটাশিয়াম (K):** উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং জল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, যা সাধারণত MOP (Muriate of Potash) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- আদর্শ অনুপাত ৪:২:১ হলেও ভারতের কিছু অঞ্চলে NPK **অনুপাত বর্তমানে ৩৪:১০:১**-এ পৌঁছেছে, যা মৃত্তিকার পুষ্টির চরম ভারসাম্যহীনতা নির্দেশ করে।

কৃষি উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় সারের গুরুত্ব

A. **কৃষি উৎপাদনশীলতা:**
   - **উচ্চ ফলনশীল** (HYV) **বীজ** তাদের জেনেটিক সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীল।
   - সীমিত আবাদি জমিতে রবি, খরিফ এবং জায়েদ মরসুমে দ্রুত পুষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে **বহুমুখী শস্য পর্যায়** (Multiple Cropping) নিশ্চিত করে।
   - খাদ্যশস্যের পাশাপাশি তৈলবীজ, ডাল এবং গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য সার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

B. **সামষ্টিক অর্থনৈতিক তাৎপর্য:**

- কৃষি ভারতের ৪২% কর্মসংস্থান এবং ১৭-১৮% GDP-তে অবদান রাখে।
- সার উদ্বৃত্ত উৎপাদন বজায় রাখে, যা Public Distribution System (PDS) বা জনবন্টন ব্যবস্থার ভিত্তি।
- স্থিতিশীল কৃষি উৎপাদন **খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি** (Food Inflation) নিয়ন্ত্রণে এবং Consumer Price Index (CPI) স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে।
- ২০২৬ সালের খরিফ মরসুমের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ফসফ্যাটিক এবং পটাশিয়াম সারের জন্য **৪১,৫৩৪ কোটি টাকা ভর্তুকি** অনুমোদন করেছে।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **আমদানি নির্ভরতা:** রক ফসফেট, পটাশ এবং সালফারের অভাব ভারতকে আমদানির ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। **হরমুজ প্রণালী** (Strait of Hormuz) দিয়ে বিশ্বের ৩০% সার বাণিজ্য হয়, যা ভূ-রাজনৈতিক উত্তজনাপ্রবণ।
- **ভর্তুকির বোঝা এবং নীতিগত বিকৃতি:** ভারত বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়। ইউরিয়া **পুষ্টি ভিত্তিক ভর্তুকি** (NBS Framework)-এর বাইরে থাকায় এটি সস্তা এবং এর অতিরিক্ত ব্যবহারের প্রবণতা বেশি।
- **অল্প দক্ষতা:** ইউরিয়ার **নাইট্রোজেন ব্যবহারের দক্ষতা** (NUE) অত্যন্ত কম; মাত্র এক-তৃতীয়াংশ শস্য দ্বারা শোষিত হয়, বাকিটা উদ্বায়ীভবন বা চুইয়ে পড়ার মাধ্যমে নষ্ট হয়।
- **মৃত্তিকার অবক্ষয় ও ফার্টিলাইজার ট্র্যাপ:** অতিরিক্ত সার ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকার জৈব পদার্থ কমে যায়। এটি **ফার্টিলাইজার ট্র্যাপ** (Fertilizer Trap) তৈরি করে, যেখানে ফলন ধরে রাখতে কৃষকরা আরও বেশি সার দিতে বাধ্য হন।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

- PM-PRANAM **প্রকল্প:** রাজ্যগুলোকে সারের ব্যবহার কমাতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার প্রচার করে।
- **ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো DAP:** পুষ্টি ব্যবহারের দক্ষতা (NUE) বাড়াতে এবং আমদানি খরচ কমাতে তরল ন্যানো সার ব্যবহার।
- **নিশিক্ত ইউরিয়া** (Neem Coated Urea)**:** নাইট্রোজেন নির্গমনের গতি ধীর করতে প্রবর্তিত।
- Soil Health Card (SHC) **প্রকল্প:** মৃত্তিকা পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার ব্যবহারের পরামর্শ দেয়।
- **দলহন আত্মনির্ভরতা মিশন (২০২৫):** অড়হর, বিউলি এবং মসুর ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য। তবে এপ্রিল ২০২৬-এর তথ্য অনুযায়ী, ডাল চাষের এলাকা মাত্র ১.২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এর দুর্বল বাস্তবায়ন নির্দেশ করে।

ভারতে সারের ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির ভবিষ্যতের পথ

- **সার সরবরাহ বৃদ্ধি থেকে পুষ্টি ব্যবহারের দক্ষতার দিকে মনোযোগ স্থানান্তর:** ভারতকে কেবল ভর্তুকি-চালিত সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর না করে সারের ব্যবহারের দক্ষতা বা Fertilizer Use Efficiency বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। কম সার প্রয়োগ করে অধিক ফলন নিশ্চিত করাই এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত। কৃষি, সার, জল, খাদ্য এবং পরিবেশ দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে Interministerial National Nitrogen Steering Committee-কে পুনরুজ্জীবিত করা জরুরি।
- **শস্যের ধরণ এবং সংগ্রহ নীতি** (Procurement Policies) **সংস্কার:** সরকারি সংগ্রহ প্রক্রিয়া কেবল ধান ও গমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ডাল, তৈলবীজ এবং মিলেটকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি অতিরিক্ত ইউরিয়া ব্যবহারের প্রবণতা কমাবে এবং **শস্য বৈচিত্র্যকরণে** (Crop Diversification) উৎসাহ দেবে। শিম্বগোত্রীয় শস্যের (Legumes) চাষ বাড়ানো প্রয়োজন,

কারণ এগুলো প্রাকৃতিকভাবে নাইট্রোজেন ধরে রাখে। ধান চাষের ২০% এলাকা যদি ডাল চাষের অধীনে আনা যায়, তবে তা সার সাশ্রয় করার পাশাপাশি জলের অপচয় রোধ করবে।

- **জৈব ও জৈবিক পুষ্টির উৎসের প্রসার:** মৃত্তিকার জৈব কার্বন (Soil Organic Carbon) পুনরুদ্ধার করতে এবং রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে গোবর সার, কম্পোস্ট, Biochar এবং **জৈব সার (Biofertilizers)**-এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। সারের সুপারিশের ক্ষেত্রে প্রথমে জৈব সারকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং রাসায়নিক সার কেবল অভাব পূরণে ব্যবহার করতে হবে। ৪০% জৈব, ৩০% জৈবিক এবং ৩০% রাসায়নিক সারের একটি সুষম মিশ্রণ দীর্ঘমেয়াদী **সুস্থিতি** নিশ্চিত করতে পারে।
- **প্রিসিশন এগ্রিকালচার (Precision Agriculture) এবং দক্ষ পুষ্টি সরবরাহ:** নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক মৃত্তিকা পরীক্ষা, Drip Fertigation এবং ড্রোনের মাধ্যমে পাতায় স্প্রে করার মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুষ্টির অপচয় রোধ করতে হবে। এই প্রযুক্তিগুলো সঠিক পরিমাণে সার সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং দূষণ কমায়।
- **গবেষণা এবং জলবায়ু সহনশীল শস্যের জাত শক্তিশালীকরণ:** উচ্চ পুষ্টি দক্ষতা সম্পন্ন এবং কম সার প্রয়োজন এমন শস্যের জাত উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। ভারতীয় গবেষণা অনুযায়ী, উন্নত ধানের জাত ফলন না কমিয়েই নাইট্রোজেন ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম।
- **সারের কাঠামোগত নীতি সংস্কার:** মূল্যের বিকৃতি সংশোধন এবং নাইট্রোজেনের অতিরিক্ত ব্যবহার কমাতে ইউরিয়াকে **পুষ্টি ভিত্তিক ভর্তুকি (NBS Framework)**-এর আওতায় আনা প্রয়োজন। Direct Benefit Transfer (DBT)-এর পরিধি বাড়ানো এবং iFMS ব্যবস্থা শক্তিশালী করলে ভর্তুকি সঠিক জায়গায় পৌঁছাবে এবং সারের অপব্যবহার রোধ হবে।

উপসংহার

- ভারতের সার সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মূলত নীতিগত বিকৃতি, সংগ্রহ প্রক্রিয়ার ভারসাম্যহীনতা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের অভাবজনিত একটি **সিস্টেমিক ব্যর্থতা (Systemic Failure)**। এর সমাধানের জন্য বিচ্ছিন্ন হস্তক্ষেপের বদলে পুরো চাষ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।
- শস্য সংগ্রহে সাহসী সংস্কার, ডাল ও শিম্বগোত্রীয় শস্য চাষে প্রকৃত উৎসাহ প্রদান, মৃত্তিকার স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সারের দামের কাঠামোগত সংশোধনের মাধ্যমেই ভারত **'ফার্টিলাইজার ট্র্যাপ'** থেকে মুক্তি পেতে পারে। এটি একইসাথে খাদ্য নিরাপত্তা, আর্থিক সুস্থিতি এবং পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করবে।

Q. India's fertilizer crisis is not merely a supply issue, but a structural challenge linked to cropping patterns, subsidy distortions, and declining soil health. Examine. 15 Marks

3.1.2. ভারতের রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ভূমিকা

- বৈশ্বিক বাণিজ্যের ব্যাঘাত, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বিশ্বব্যাপী চাহিদা হ্রাসের সত্ত্বেও ভারতের **রপ্তানি খাত (export sector)** উল্লেখযোগ্য **স্থিতিস্থাপকতা (resilience)** প্রদর্শন করেছে।
- ২০২৬ সালের এপ্রিলে পণ্য রপ্তানি প্রায় ১৪% বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, পাশাপাশি অ-তৈল (non-oil) রপ্তানিও প্রায় ৯% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভারতের ক্রমবর্ধমান **বহুমুখীকরণ (diversification)** এবং **সরবরাহ শৃঙ্খলের শক্তিকে (supply chain strength)** প্রতিফলিত করে।

- তবে, ভারত এখনও **ব্যয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা** (cost competitiveness), **লজিস্টিকস দক্ষতা** (logistics efficiency), **মানের মানদণ্ড** (quality standards) এবং **বৈশ্বিক বাজার একীকরণের** (global market integration) সাথে সম্পর্কিত বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

ভারতের রপ্তানি অর্থনীতির উদীয়মান প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি

ক. ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিমিয়াম স্মার্টফোন উৎপাদন

- **উচ্চ-মূল্যের উৎপাদনের দিকে রূপান্তর** (High-Value Manufacturing)**:** ভারত দ্রুত সাধারণ সংযোজন কেন্দ্র থেকে একটি অত্যাধুনিক বৈশ্বিক উৎপাদন হাবে পরিণত হয়েছে। **'চীন প্লাস ওয়ান'** (China Plus One) সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠনের সুযোগ নিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলো এখন চীন থেকে সরে এসে ভারতে বিনিয়োগ করছে।
- **PLI-চালিত পরিবর্তন: উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা** (PLI) প্রকল্প উপাদান উৎপাদনে উৎসাহিত করেছে, যা এই খাতকে উচ্চ-মূল্যের প্রিমিয়াম ডিভাইসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ২০২৫ ক্যালেন্ডার বছরে স্মার্টফোন রপ্তানি রেকর্ড **৩০ বিলিয়ন ডলারে** পৌঁছেছে (মূলত অ্যাপল-এর কারণে), যা মোট ইলেকট্রনিক্স রপ্তানিকে **৪ ট্রিলিয়ন টাকার** মাইলফলক পার করতে সাহায্য করেছে।

খ. পরিষেবা খাত এবং গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (GCC)

- **বাণিজ্যের প্রধান স্তম্ভ হিসেবে পরিষেবা:** ভারতের পরিষেবা খাত বৈদেশিক বাণিজ্যের সবচেয়ে স্থিতিশীল স্তম্ভে পরিণত হয়েছে, যা পণ্য বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে। মোট রপ্তানিতে পরিষেবার অংশ ২০১৪ সালের ৩৯% থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে **৪৯%** হয়েছে।
- **সাধারণ আইটি আউটসোর্সিং-এর ঊর্ধ্বে: গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার** (GCC) গুলোর বিস্ফোরক বৃদ্ধি উচ্চ-মানের গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা** (AI) এবং আর্থিক সমাধান প্রদানের মাধ্যমে ভারতের **জ্ঞান রপ্তানিকে** (Knowledge Exports) বিশ্বজুড়ে উন্নত করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পরিষেবা রপ্তানি **৩৮৭.৬ বিলিয়ন ডলারের** সর্বকালীন উচ্চতা স্পর্শ করেছে।

গ. প্রতিরক্ষা দেশীয়করণ এবং কৌশলগত রপ্তানি পরিবর্তন

- **আমদানিকারক থেকে রপ্তানিকারক:** ভারত একটি গভীর কৌশলগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে—প্রতিরক্ষা আমদানির ওপর ঐতিহাসিক নির্ভরতা কমিয়ে উন্নত সামরিক হার্ডওয়্যারের নেট রপ্তানিকারক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এর মূলে রয়েছে **'আত্মনির্ভর ভারত'** (Atmanirbhar Bharat) ম্যান্ডেট এবং নেতিবাচক আমদানি তালিকা।
- **রেকর্ড প্রতিরক্ষা রপ্তানি:** ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা রপ্তানি রেকর্ড **২৩,৬২২ কোটি টাকায়** পৌঁছেছে। ভারত এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং আর্মেনিয়া সহ ১০০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করে এবং ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোর সাথে **ব্রহ্মোস** (BrahMos) মিসাইল চুক্তির চেষ্টা করছে।

ঘ. কৌশলগত বাণিজ্য বহুমুখীকরণ এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)

- **নতুন গন্তব্য, নতুন পথ:** সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে অন্তত ২০টি রপ্তানি খাত ১৭টি বা তার বেশি নতুন গন্তব্য যুক্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, হস্তচালিত পণ্য (Handloom) এখন ২০২৪-২৫ সালের তুলনায় আরও ২৯টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে, যা ভারতের **বহুমুখীকরণ** (Diversification) প্রচেষ্টার প্রভাব প্রমাণ করে।
- **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সুফল:** ভারত-ইএফটিএ (India-EFTA) চুক্তি ১৫ বছরে **১০০ বিলিয়ন ডলারের** আইনিভাবে বাধ্যতামূলক সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রতিশ্রুতি দেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং নিউজিল্যান্ডের সাথে নতুন চুক্তিগুলো ভারতের প্রধান রপ্তানি পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাসে সহায়তা করছে। UNCTAD বর্তমানে বাণিজ্য বহুমুখীকরণে ভারতকে 'গ্লোবাল সাউথ'-এ তৃতীয় স্থানে রেখেছে।

ঙ. **ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য**

- **জেনেরিকের বাইরে ফার্মা:** ভারতের ওষুধ শিল্প সাধারণ জেনেরিক ওষুধ থেকে উন্নত **বায়োলজিক্যালস** (Biologicals) এবং জটিল ফর্মুলেশন তৈরির দিকে এগোচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ওষুধ রপ্তানি ৯.৪% বৃদ্ধি পেয়ে **৩০ বিলিয়ন ডলারের** মাইলফলক অতিক্রম করেছে।
- **ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের স্থিতিস্থাপকতা:** ভারতের অন্যতম প্রধান রপ্তানি খাত হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য ২০২৬ সালের এপ্রিলে গত বছরের তুলনায় বেশি রপ্তানি হয়েছে। উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন অটোমোটিভ, এভিয়েশন এবং পরিকাঠামো সরবরাহ শৃঙ্খলের উন্নতির কারণে এই খাতের রপ্তানি জানুয়ারি ২০২৬-এ **১০.৪০ বিলিয়ন ডলার** ছাড়িয়েছে।

চ. **কৃষি রপ্তানি এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি উৎপাদন**

- **স্থিতিশীল কৃষি রপ্তানি:** ২০২৫ সালে ভারতের কৃষি রপ্তানি **৫১.৯ বিলিয়ন ডলারের** মাইলফলক বজায় রেখেছে। এখানে কাঁচা পণ্যের পরিবর্তে জলবায়ু-সহনশীল, **মূল্য-সংযোজিত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য** (Value-added processed foods) যেমন রেডি-টু-ইট খাবার এবং **অর্গানিক মিলেট** (Organic Millets) রপ্তানির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে, যা মেগা ফুড পার্ক এবং APEDA-র মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- **সোলার মডিউল রপ্তানি:** বৈশ্বিক জ্বালানি পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে ভারত সোলার মডিউল রপ্তানি ২০২৫ সালের এপ্রিল-অক্টোবরের মধ্যে ৩০.৭% বৃদ্ধি করেছে, যার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই গিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আমদানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে রপ্তানি শক্তিতে এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছে সৌর ফটোভোলটাইক (PV) উৎপাদনের জন্য বরাদ্দ হওয়া বহু বিলিয়ন ডলারের PLI প্রকল্পের মাধ্যমে।

ভারতের রপ্তানি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সীমাবদ্ধকারী প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ক. **কাঠামোগত লজিস্টিকস প্রতিবন্ধকতা**

- **উচ্চ লজিস্টিকস খরচ:** 'পিএম গতিশক্তি' (PM GatiShakti) প্রকল্পের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সড়ক পরিবহনের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে ভারতের লজিস্টিকস খরচ এখনও অনেক বেশি। পণ্য পরিবহনের প্রায় ৭১% সড়কপথে, ১৮% রেলপথের মাধ্যমে এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Water Transport) মাত্র ২%-এ সীমাবদ্ধ। এটি ভারতীয় পণ্যের চূড়ান্ত বাজারমূল্য (Landed Cost) বাড়িয়ে দিচ্ছে।
- **পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য বিঘ্ন:** পশ্চিম এশিয়া সংকটের কারণে ২০২৬ সালের এপ্রিলে ওই অঞ্চলে রপ্তানি ২৮% হ্রাস পেয়েছে এবং আমদানি ৩২% কমেছে। এটি ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতি ভারতের **সুভেদ্যতাকে** (Vulnerability) প্রকাশ করে।

খ. **কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম (CBAM) এবং সবুজ পরিপালন**

- **নতুন বাণিজ্য বাধা হিসেবে CBAM:** ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম (CBAM), যা ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে তার আর্থিক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, ভারতের কার্বন-নিবিড় রপ্তানি পণ্য যেমন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং সিমেন্টের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় ইস্পাত রপ্তানিকারকরা ২০-৩৫% অতিরিক্ত করের বোঝা সম্মুখীন হতে পারেন, যা ইউরোপের বাজারে ভারতীয় ধাতুর মূল্যের সুবিধাকে নষ্ট করে দিতে পারে।
- **MSME পরিপালন ব্যবধান:** অনেক ভারতীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (MSME) কাছে CBAM পরিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক **কার্বন অ্যাকাউন্টিং পরিকাঠামো** (Carbon Accounting Infrastructure) নেই। এর ফলে তারা হয় উচ্চ কার্বন ট্যাক্সের মুখে পড়বে, না হয় লাভজনক ইউরোপীয় বাজার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে।

গ. **ঋণের ব্যবধান এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) নিম্ন ব্যবহার**

- **MSME ঋণের ব্যবধান:** বর্তমানে MSME খাতের ঋণের ব্যবধান প্রায় **৩০ লক্ষ কোটি টাকার** মতো। রপ্তানি ঋণের সুদের হার বৈশ্বিক প্রতিযোগীদের তুলনায় ২-৪% বেশি, যা ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন করে তোলে।
- **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির নিম্ন ব্যবহার:** বেশ কিছু উচ্চ-পর্যায়ের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) থাকা সত্ত্বেও, পুরনো চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে দেশীয় রপ্তানিকারকদের ব্যবহারের হার ২৫%-এর নিচে (উন্নত দেশগুলোতে যা ৭০-৮০%)। জটিল **রুলস অফ অরিজিন** (Rules of Origin) এবং সচেতনতার অভাবই এর প্রধান বাধা।

ঘ. **ইনভার্টেড ডিউটি স্ট্রাকচার, শুল্ক-বহির্ভূত বাধা এবং কেন্দ্রীকরণ ঝুঁকি**

- **ইনভার্টেড ডিউটি স্ট্রাকচার** (Inverted Duty Structure)**:** যখন কাঁচামালের ওপর করের হার তৈরি পণ্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন তাকে ইনভার্টেড ডিউটি স্ট্রাকচার বলে। এটি ইলেকট্রনিক্স এবং রাসায়নিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে দেশীয় **মূল্য সংযোজনকে** (Value Addition) নিরুৎসাহিত করে।
  - ওষুধ তৈরির কাঁচামাল বা **অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট** (API)-এর জন্য ৭০%-এর বেশি চীনের ওপর নির্ভরতা ভারতের ওষুধ রপ্তানিকে সরবরাহ বিঘ্নের ঝুঁকিতে ফেলে।
- **শুল্ক-বহির্ভূত বাধা** (Non-Tariff Barriers)**:** ভারতীয় রপ্তানিকারকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে ক্রমবর্ধমান কঠোর **স্যানিটারি এবং ফাইটোস্যানিটারি** (SPS) ব্যবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে।
  - HS04 কোডের অধীনে, ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ভারত ৩৪৪টি চালান প্রত্যাখানের সম্মুখীন হয়েছে।
  - এছাড়া, ভারতের রপ্তানি ঝুড়ি এখনও মূলত পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং রত্ন ও অলংকারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল। এই পণ্যগুলোর বৈশ্বিক দামের অস্থিরতা ভারতের **বাণিজ্য ভারসাম্যকে** (Trade Balance) কাঠামোগতভাবে দুর্বল করে তোলে।

ভারতের রপ্তানি প্রতিদ্বন্দ্বিতা শক্তিশালী করার ভবিষ্যতের পথ

- **একীভূত ডিজিটাল বাণিজ্য স্থাপত্য** (Unified Digital Trade Architecture)**:** ভারতকে একটি এআই-চালিত (AI-driven) **'সিঙ্গেল উইন্ডো ২.০'** কার্যকর করতে হবে, যা শুল্ক, শিপিং এবং গুণমান শংসাপত্র প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে একীভূত করবে। এটি **'রুলস অফ অরিজিন'** যাচাইকরণকে স্বয়ংক্রিয় করবে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) জন্য ঘর্ষণহীন বাণিজ্য নিশ্চিত করতে 'ট্রাস্টেড সাপ্লায়ার গ্রিন-চ্যানেল ক্লিয়ারেন্স' প্রদান করবে।
- **কৌশলগত উপাদান উৎপাদন এবং PLI ৩.০:** নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত পণ্য সংযোজন (Assembly) থেকে সরে এসে **গভীর-স্তরের উপাদান উৎপাদনের** (Deep-tier component manufacturing) দিকে নজর দিতে হবে। বিরল মৃত্তিকা প্রক্রিয়াকরণ (Rare earth processing), সেমিকন্ডাক্টর সামগ্রী এবং রাসায়নিক মধ্যবর্তী পণ্যের জন্য **PLI ৩.০** চালু করে আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।
- **সবুজ রপ্তানি ঋণ এবং কার্বন অ্যাকাউন্টিং কাঠামো:** ইস্পাত এবং টেক্সটাইল খাতের কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য একটি **'সবুজ রপ্তানি ঋণ'** (Green Export Credit) সুবিধা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি, দেশীয় কার্বন অ্যাকাউন্টিং কাঠামো রপ্তানিকারকদের CBAM পরিপালন করতে অগ্রিম সহায়তা করবে।
- **বন্দর-ভিত্তিক শিল্পায়ন এবং মোডাল রিব্যালেন্সিং:** ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরগুলোকে সরাসরি স্বয়ংক্রিয় মেগা পোর্টের সাথে যুক্ত করতে হবে। পণ্য পরিবহন সড়কপথ থেকে উপকূলীয় শিপিং এবং অভ্যন্তরীণ জলপথে স্থানান্তরিত করলে পণ্যের **ল্যান্ডেড কস্ট** (Landed Cost) ২০-৩০% হ্রাস পাবে, যা ভারতের মূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আরও তীক্ষ্ণ করবে।
- **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সহায়তা কেন্দ্র এবং ট্রেড অ্যাটাচে:** জেলা স্তরে FTA **সহায়তা কেন্দ্র** স্থাপন করতে হবে যা পণ্য-ভিত্তিক শুল্ক তথ্য প্রদান করবে। এছাড়া, জিসিসি (GCC) এবং আফ্রিকার মতো উদীয়মান বাজারগুলোতে নিবেদিত **'ট্রেড**

অ্যাটাচে' (Trade Attaches) নিয়োগ করতে হবে, যাতে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিগুলোর সুবিধা ভারত পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে।

- **বৈচিত্র্যময় বাণিজ্য অর্থায়ন এবং রপ্তানি ফ্যাক্টরিং:** ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেমকে (TReDS) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করতে হবে। একটি **সার্বভৌম রপ্তানি বীমা তহবিল** (Sovereign Export Insurance Fund) গঠন করলে MSME-গুলোর জন্য জামানতবিহীন কার্যকরী মূলধন আনলক হবে এবং অপ্রচলিত উচ্চ-বৃদ্ধির বাজারগুলোর পথ প্রশস্ত হবে।
- **গুণমান সমন্বয় এবং পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (MRA):** প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের সাথে **পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি** (MRA) স্বাক্ষর করতে হবে যাতে ভারতীয় ল্যাবরেটরির শংসাপত্র বিশ্বব্যাপী গৃহীত হয়। কৃষি ও ওষুধ রপ্তানির বারবার প্রত্যাখ্যান রোধ করতে জাতীয় গুণমান পরিকাঠামো এবং অত্যাধুনিক টেস্টিং ক্লাস্টারে বিনিয়োগ করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের শক্তিশালী রপ্তানি কর্মক্ষমতা তার বহুমুখীকরণ প্রচেষ্টার প্রাথমিক সাফল্যকে প্রতিফলিত করে। তবে এই গতি বজায় রাখতে লজিস্টিকস, অর্থায়ন, গুণমান মানদণ্ড এবং উৎপাদন সক্ষমতায় গভীর **কাঠামোগত সংস্কার** (Structural Reforms) প্রয়োজন, যাতে দেশ একটি বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রপ্তানি-চালিত অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

Q. India's export diversification strategy has improved resilience against global trade disruptions, but structural bottlenecks continue to limit export competitiveness. Examine. 15 Marks

3.2. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

3.2.1. সাইবার যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক আইনি জবাবদিহিতার সংকট

প্রেক্ষিত

- **আমেরিকা, ইসরায়েল এবং ইরানের** মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা উন্মোচিত করেছে যে আধুনিক যুদ্ধ এখন আর কেবল শারীরিক যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।
- প্রচলিত সামরিক হামলার পাশাপাশি, এই সংঘাতগুলোতে সংবাদপত্রের ওয়েবসাইট হ্যাক করা, যোগাযোগের অ্যাপ্লিকেশনে বিঘ্ন ঘটানো এবং **তথ্য পরিবেশ** (Information Environment) ম্যানিপুলেট করার জন্য **সাইবার অপারেশনের** সক্রিয় ব্যবহার দেখা গেছে।
- এই পরিবর্তনটি বৈশ্বিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি নিষ্পত্তিমূলক মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে **ডিজিটাল বিঘ্ন** (Digital Disruption) সামরিক কৌশলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, যা একই সাথে বেসামরিক অবকাঠামো, প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক এবং সরকারি ব্যবস্থাকে লক্ষ্যবস্তু করছে।

সাইবার যুদ্ধ এবং ডিজিটাল বিঘ্নের আধুনিক ল্যান্ডস্কেপ বোঝা

- **সাইবার যুদ্ধ সম্পর্কে:** সাইবার যুদ্ধ বলতে রাষ্ট্র বা অ-রাষ্ট্রীয় পক্ষগুলোর দ্বারা **হ্যাকিং**, ডিজিটাল বিঘ্ন এবং তথ্য ম্যানিপুলেশনের ব্যবহারকে বোঝায় যা শত্রুকে দুর্বল করার জন্য ব্যবহৃত হয়; এটি প্রায়শই শারীরিক সামরিক অভিযানের আগে বা পাশাপাশি পরিচালিত হয়।
- **গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা:** সাইবার অপারেশনগুলো প্রায়শই **গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো** (Critical Infrastructure), প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করে, যা প্রথাগত শারীরিক যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে সংঘাতকে বিস্তৃত করে।

- **অ-রাষ্ট্রীয় পক্ষগুলোর (Non-State Actors) ক্রমবর্ধমান ভূমিকা:** বেশ কিছু অ-রাষ্ট্রীয় সাইবার গোষ্ঠী, যেমন **'হান্দালা হ্যাক টিম' (Handala Hack Team)**, বিদেশি সংস্থাগুলোর ওপর হামলা চালিয়েছে বলে জানা গেছে, যার মধ্যে একটি মার্কিন-ভিত্তিক চিকিৎসা প্রযুক্তি সংস্থাও রয়েছে; এটি বৈশ্বিক সংঘাতে সাইবার যোদ্ধাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে তুলে ধরে।
- **বেসামরিক ও বাণিজ্যিক খাতের ওপর প্রভাব:** সাইবার অপারেশনগুলো বিদ্যুৎ গ্রিড, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, জল সরবরাহ নেটওয়ার্ক এবং প্রতিরক্ষা যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করে, যার ফলে বেসামরিক জীবনের ওপর এর প্রভাব **বিপর্যয়কর (Catastrophic)** হতে পারে।
- **নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ:** প্রচলিত যুদ্ধের বিপরীতে, সাইবার আক্রমণ সরাসরি সামরিক মোকাবিলা ছাড়াই সীমান্ত অতিক্রম করতে পারে, যা বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর অধীনে এগুলি শনাক্ত করা, **আরোপ করা (Attribute)** এবং নিয়ন্ত্রণ করা অনেক বেশি কঠিন করে তোলে।

সাইবার স্পেসে আইনি সীমারেখা টানা কেন এত কঠিন?

- আন্তর্জাতিক আইনে কিছু প্রাসঙ্গিক নীতি বিদ্যমান রয়েছে। **জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ২(৪)** এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ করে এবং **রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের (State Responsibility)** নীতি রাষ্ট্রগুলোকে আন্তর্জাতিকভাবে অন্যায় কাজের জন্য দায়ী করে—উভয় নীতিই তাত্ত্বিকভাবে সাইবার স্পেসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- যাইহোক, মূল চ্যালেঞ্জ হলো এটি নির্ধারণ করা যে কখন একটি সাইবার অপারেশন পর্যাপ্ত পরিমাণে গুরুতর হয়ে ওঠে যাতে সেটিকে **বলপ্রয়োগের নিষিদ্ধ ব্যবহার (Prohibited Use of Force)** বা আন্তর্জাতিকভাবে অন্যায় কাজ হিসেবে গণ্য করা যায়।
- **সাইবার ক্ষতির 'গ্রে জোন' (Grey Zone of Cyber Harm):**
  - সাইবার আক্রমণগুলো প্রায়শই পরোক্ষ, সাময়িক বা অ-শারীরিক ক্ষতি করে যা প্রচলিত অস্ত্রের দ্বারা হওয়া ধ্বংসলীলার তুলনায় পরিমাপ করা অনেক বেশি কঠিন।
  - নির্বাচনী ডেটাবেস ব্যাহত করা, হাসপাতালের নেটওয়ার্ক ধীর করে দেওয়া বা আর্থিক বাজারে হস্তক্ষেপ করা বিশাল ক্ষতির কারণ হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের কাজগুলো **যুদ্ধের কাজ (Act of War)** হিসেবে গণ্য হবে কি না তা আইনত অস্পষ্ট থেকে যায়।
  - **'তালিন ম্যানুয়াল' (Tallinn Manual)**, যা ন্যাটো (NATO) সাইবার বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রস্তুত একটি অ-বাধ্যতামূলক একাডেমিক নথি, সাইবার অপারেশন কখন আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করে, তবে এতে **আইনি প্রয়োগযোগ্যতা (Legal Enforceability)** এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার অভাব রয়েছে।
- এটি একটি গভীর সমস্যাযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে সাইবার স্পেসে উল্লেখযোগ্য এবং ইচ্ছাকৃত ক্ষতি করা সত্ত্বেও কোনো আনুষ্ঠানিক আইনি প্রতিক্রিয়া শুরু হয় না, যার ফলে ভুক্তভোগীরা কোনো অর্থবহ প্রতিকার পায় না।

সাইবার দ্বন্দ্বে আইনি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **আরোপণ সমস্যা (Attribution Problem): প্রমাণ ছাড়াই জানা**

- সাইবার অপারেশনগুলো সাধারণত **লুকানো নেটওয়ার্ক (Hidden Networks)**, প্রক্সি সার্ভার এবং একাধিক বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা আদালতের মানদণ্ড অনুযায়ী প্রকৃত অপরাধীকে শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে।
- কোনো হামলার পেছনে কারা রয়েছে সে সম্পর্কে সরকারগুলোর কাছে **গোয়েন্দা তথ্যের (Intelligence)** ভিত্তিতে দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকতে পারে, কিন্তু সেই তথ্যকে আদালতে গ্রহণযোগ্য আইনি প্রমাণে রূপান্তর করা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চ্যালেঞ্জ।
- এটি রাজনৈতিক নিশ্চয়তা এবং **আইনি প্রমাণের (Legal Proof)** মধ্যে একটি গুরুতর ব্যবধান তৈরি করে; এবং নির্ভরযোগ্য আরোপণ বা শনাক্তকরণ ছাড়া আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে কোনো রাষ্ট্রকে জবাবদিহি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২. **ফোরাম বা বিচারালয় সমস্যা: বিচারের কোনো জায়গা নেই**

- **আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ)** কেবল সেই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে যারা এর এক্তিয়ার মেনে নিতে সম্মত হয়; কিন্তু সাইবার অপারেশনে লিপ্ত রাষ্ট্রগুলো খুব কমই এই সম্মতি দেয়।
- দেশের অভ্যন্তরীণ আদালতগুলো **সার্বভৌম দায়মুক্তি (Sovereign Immunity)** বা আইনি রক্ষাকবচের বাধার সম্মুখীন হয়, যা বিদেশি সরকারগুলোকে অন্য দেশের আইনি ব্যবস্থায় অভিযুক্ত হওয়া থেকে সুরক্ষা দেয়।
- এর ফলে, রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত সাইবার হামলার শিকার হওয়া পক্ষগুলোর কাছে বিচার বা ক্ষতিপূরণ চাওয়ার মতো অত্যন্ত সীমিত আইনি পথ খোলা থাকে।

৩. **রাজনৈতিক ও কৌশলগত হিসাব-নিকাশ যা আইনি পদক্ষেপকে বাধা দেয়**

- রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা এড়িয়ে চলে, কারণ এতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে, কূটনৈতিক প্রতিহিংসা ডেকে আনতে পারে অথবা সংবেদনশীল গোয়েন্দা সক্ষমতা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হতে পারে।
- এই কারণে, বেশিরভাগ সাইবার ঘটনা আদালত বা আনুষ্ঠানিক আইনি প্রক্রিয়ার পরিবর্তে **নেপথ্য কূটনীতি (Back-channel Diplomacy)** এবং রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়, যা জবাবদিহিতার সংস্কৃতিকে আরও দুর্বল করে দেয়।

৪. **প্রমাণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ: জটিল, শ্রেণীবদ্ধ এবং উপস্থাপন করা কঠিন**

- সাইবার মামলাগুলোতে অত্যন্ত উচ্চমানের প্রযুক্তিগত ডেটা, শ্রেণীবদ্ধ গোয়েন্দা তথ্য এবং কারণ-ফলাফলের জটিল শৃঙ্খল জড়িত থাকে, যা মূল্যায়ন করার মতো সরঞ্জাম বা দক্ষতা আদালতের কাছে প্রায়ই থাকে না।
- কে আক্রমণ করেছে, এটি কতটা ক্ষতি করেছে এবং ঠিক কীভাবে এই ক্ষতি হয়েছে—তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে পর্যায়ের **প্রযুক্তিগত নির্ভুলতা (Technical Precision)** প্রয়োজন, তা আইনি কার্যধারায় অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন।

আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা এবং কেন সেগুলি ব্যর্থ হচ্ছে

- **বুদাপেস্ট কনভেনশন (২০০১):** সাইবার অপরাধের ওপর এটি সবচেয়ে বহুল পরিচিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, যার সদস্য সংখ্যা ৬৮টিরও বেশি। এটি আন্তঃসীমান্ত সাইবার অপরাধ তদন্ত ও বিচারে সহযোগিতার ওপর জোর দেয়।
- **জাতিসংঘ সাইবার অপরাধ সম্মেলন (২০২৪):** এটি সাইবার হুমকি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য একটি বিস্তৃত বৈশ্বিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে।
- **UN GGE এবং OEWG:** জাতিসংঘের এই দলগুলো সাইবার স্পেসে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল আচরণের নিয়মনীতি বা **নর্মস (Norms)** তৈরিতে ঐকমত্য তৈরির কাজ করছে, যদিও এখন পর্যন্ত কোনো বাধ্যতামূলক চুক্তি হয়নি।
- **এই কাঠামোগুলোর প্রধান সীমাবদ্ধতা:** এগুলি মূলত সাইবার অপরাধ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতার ওপর আলোকপাত করে। ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অংশ হিসেবে **রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত সাইবার যুদ্ধের (State-sponsored Cyber Warfare)** বিষয়টি মোকাবেলায় এগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যর্থ। সশস্ত্র যুদ্ধের সময় সাইবার অপারেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো **বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তি (Binding International Treaty)** এখনো নেই।

ভারতের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি এবং সাইবার নীতিমালা প্রণয়নে এর প্রয়োজনীয় ভূমিকা

- অর্থনীতি, প্রশাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং জ্বালানির মতো ক্ষেত্রগুলোতে ভারতের দ্রুত ডিজিটাল সম্প্রসারণ এবং **UPI, আধার (Aadhaar)** ও পাওয়ার গ্রিডের মতো প্ল্যাটফর্মের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা ভারতের **গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে (Critical Infrastructure)** সাইবার হামলার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলেছে।

- CERT-In-এর তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালে ভারতে ১৩ লক্ষেরও বেশি সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে, যার মধ্যে বৈরী রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত আক্রমণও রয়েছে; যা শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক সাইবার নীতিমালার জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।
- **ভবিষ্যতে ভারতের করণীয়:**
  - সাইবার স্পেসে দায়িত্বশীল আচরণের স্পষ্ট নিয়ম এবং বাধ্যতামূলক জবাবদিহিতা ব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি করতে জাতিসংঘের UN GGE এবং OEWG-তে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।
  - **জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা নীতি** (National Cyber Security Policy) শক্তিশালী করা এবং CERT-In ও NCIIPC-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
  - উন্নততর আরোপণ বা শনাক্তকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সাইবার হুমকির সমন্বিত মোকাবেলার জন্য সমমনা দেশগুলোর সাথে শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সাইবার সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তোলা।
  - রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত সাইবার যুদ্ধের জন্য একটি আইনিভাবে বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তি তৈরিতে অবদান রাখা, যেখানে জবাবদিহিতা এবং স্পষ্ট শনাক্তকরণ বা **আরোপণ মানদণ্ড** (Attribution Standards) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
  - দক্ষ সাইবার জনবল তৈরি, উন্নত হুমকি শনাক্তকরণ অবকাঠামো এবং নিয়মিত সাইবার রেজিলিয়েন্স মহড়ার মাধ্যমে দেশীয় সাইবার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বড় বিনিয়োগ করা।

উপসংহার

সাইবার যুদ্ধ আধুনিক সংঘাতের প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে, যার ফলে একটি বিপজ্জনক **জবাবদিহিতার শূন্যতা** (Accountability Gap) তৈরি হয়েছে যা শত্রু পক্ষগুলো অনবরত ব্যবহার করে চলেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি সাইবার স্পেসে জবাবদিহিতার জন্য নির্ভরযোগ্য, প্রয়োগযোগ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা তৈরি করতে না পারে, তবে আইনের নাগালের বাইরে বড় আকারের ক্ষতি চলতেই থাকবে—যা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, বেসামরিক নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক ব্যবস্থার অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ফেলবে।

Q. Cyber warfare is outpacing the evolution of international legal accountability. Critically examine the challenges posed by cyber warfare and suggest measures for strengthening global cyber governance.

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video